আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির
শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের ভিতরে শিরক ও বেদাত নিয়ে যে ফেৎনা ফাসাদ দেখা দিয়েছে, তাকে লক্ষ্য করে শিরক ও বেদাতের শক্ত জবাব কোরআন হাদিসের আলোকে দিয়ে দিলাম।

মানুষ যে কথায় কথায় শিরক বলে, শিরক আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ শরীক বা পার্টনার বানানো কোন মানুষ মহান আল্লাহতায়ালাকে শরীক বানাতে পারে না। কেন মানুষ এমন মহাপাপের কথা বলে? মহান আল্লাহতায়ালাকে কীভাবে শরীক করে? মহান আল্লাহ সমস্ত কুল-কায়নাতের মালিক। মানুষ তো কুল-কায়ানাতে মালিক না। মানুষ তো মহান আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি। কীভাবে সৃষ্টিকর্তার সাথে শরীক মনে করে?

হে পাঠকগণ! আপনারা চিন্তা করে দেখুন, যারা এটা মনে করবে তারাই মহা পাপী। তারাই বড় শিরক করতেছে। মহান আল্লাহতায়ালার সাথে শরীক করার কোন রাস্তা নাই, কোন সুযোগ নাই। মহান আল্লাহতায়ালা এমন রাস্তা রাখেন নাই। এটার কোন বিধান নাই। কীভাবে শিরক হবে? যিনি সৃষ্টি জগতের লালনকর্তা, পালনকর্তা সমস্ত কুল-কায়নাতের মালিক, বিচারদিনের হাকীম, সেই মহান আল্লাহতায়ালার সাথে শরীক করার দুঃসাহস কোন জীব জাতের আছে? কাজেই আপনারা চিন্তা করে দেখুন এই বিষয়টি। শিরক! শিরক! শিরক! এই কথা অন্তর থেকে সরিয়ে ফেলুন। নিজে পবিত্র হয়ে যান, এবং অন্যকেও পবিত্রতার পরামর্শ দেন। শিরক! শিরক! শিরক! এই কথাটা মেহেরবাণী করে আর বললেন না। এটা মহান আল্লাহতায়ালার কাছে অপছন্দনীয়। শিরক করার কোনো সুযোগও নাই। মহান আল্লাহকে ধরা যায় না। কাজেই এখানে শিরক বলতে কিছুই নাই।

মূল কথা, শিরক অর্থ মহান আল্লাহতায়ালার সাথে শরীক বা পার্টনার বানানো, যার কোনই সুযোগ নাই। তবে মহান আল্লাহতায়ালা নবী রাসুলদের কিছু মোজেযা দান করেছেন আর অলি-আউলিয়াদেরকে কারামত দান করেছেন। এটা মহান আল্লাহতায়ালার খাস দয়া। যেমন হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে দান করেছেন। তিনি তাঁর শাহাদাৎ আঙ্গুলের দ্বারা চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখিয়েছেন। এছাড়াও বহু ঘটনা আছে। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-কে মহান আল্লাহতায়াল লাঠি মোবারক দান করেছেন। এই লাঠি মোবারকের মধ্যে সমস্ত মোজেযা ছিল। হযরত সোলাইমান (আঃ)-কে মহান আল্লাহতায়ালা কাঠের তক্তা দান করেছেন। এই তক্তাকে সোলায়মান (আঃ) যখন বলতেন, চলো– সারা দুনিয়া ঘুরে আসি। এছাড়াও হযরত সোলয়মান (আঃ)-কে আংটি ও চাবুক দান করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে সমস্ত মোজেযা লুকিয়েছিল। সুরা নামল-এর মধ্যে দেখা যায়, রাণী বিলকিসের সিংহাসনের কথা, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, যার নাম আসিফ বিন বরখিয়া, তিনি মুহূর্তের মধ্যে শত শত মাইল দূর থেকে রাণী বিলকিসের সিংহাসন এনে হাজির করেছেন।

হে অবিশ্বাসীরা, এই এলেমকে কি শিরক বা পাপ বলবেন? এটা আসিফ বিন

বরখিয়ার কারামত। আউলিয়াদের ব্যাপারে খাজা খিজির (আঃ) যার কাছে মুসা (আঃ)-কে মহান আল্লাহতায়ালা পাঠিয়েছিলেন। 'ওয়া আল্লামনা-হু মিল্লাদুন্না ইলমা' অর্থ: আপনাকে যে সত্য জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন?' সুরা কাহ্‌াফ ৬৫ নং আয়াত। খিজির (আঃ) ৩টি অলৌকিক কারামত প্রকাশ করেছিলেন- (এক) নৌকার তক্তা ভেঙে দিয়েছিলেন, (দুই) একটা যুবককে কাতেল বা হত্যা করেছিলেন, (তিন) একটা বাড়ির ভাঙা দেয়াল মেরামত করেছিলেন। এই হাকিকত কি আপনারা বুঝার চেষ্টা করেন। এটা মহান আল্লাহতায়ালার দেওয়া গায়েবী এলেম বা এলমে লাদুন্না। অলি- আউলিয়াদের কেরামত সত্য। নবী করিম (সঃ)-এর মোজেযা সত্য। এগুলো যারা অস্বীকার করবে, তারা ঈমানদার না। যারা কোরআন হাদিস কিছু মানলো, কিছু মানলো না তারা প্রকৃত পক্ষে ঈমানদার না। তাই মহান আল্লাহতায়ালা সুরা জারিয়াতের ২১নং আয়াতের মধ্যে বলেন– 'ওয়া ফী-আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন।' অর্থ- 'আমি তোমার ভিতরে রহিয়াছি তুমি খোঁজ না, তাই পাও না। তালাসী বান্দার দিলের জানালা দিয়া আমি দেখা দিয়ে থাকি।' তাহলে এটাও কি আপনারা অবিশ্বাস করবেন? বা শিরক বলবেন? এটাও কি গুনাহ বলবেন? মহান আল্লাহতায়ালা সুরা ক্বাফ-এর ১৬নং আয়াতে বলেন– 'ওয়া নাহনু আক্বরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল্ ওয়ারীদ্' অর্থ- 'আমি তোমার শাহ্‌রগের চেয়েও অতি নিকটে।'

হে পাঠকগণ! আপনারা চিন্তা করে দেখুন, যারা কথায় কথায় শিরক বলতেছেন, ছড়াচ্ছেন এটা একটা ভাইরাস, রোগ-ব্যাধি হিংসার কথা, মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বলা। আর বলবেন না, আর বলিয়েন না। আপনারা পরিশুদ্ধ মনে এবাদত-বন্দেগী করে যান। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন, কলুষমুক্ত করেন। আত্মা পরিশুদ্ধির কথা মহান আল্লাহতায়ালা কোরআনের বহু জায়গায় বলেছেন। সুরা আ'লা আয়াত নং ১৪ ও ১৫, উচ্চারণ- 'ক্বাদ আফলাহা মান তাযাক্কা ওয়া যাকারাসমা রাব্বিহী ফাস্বাল্লা।' অর্থ- 'সেইতো কামিয়াব হবে, যে আত্মশুদ্ধি করে এবং তার রবের নামে জিকির করে আর নামাজ আদায় করে'। আপনার আত্মা বিশুদ্ধ হয়ে গেলে, আপনার ভিতর থেকে এ সমস্ত কু-খেয়াল, কু-চিন্তা, খারাপ ধারণা, 'শিরক! শিরক, বেদাত! বেদাত' এ সমস্ত ভিতর থেকে চলে যাবে। আপনি একজন পরিশুদ্ধ মানুষ হয়ে যান। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলি, আপনারা এ সমস্ত বিষয় মহান আল্লাহতায়ালা মহা ভেদের রহস্য জানতে হলে কোরআনের মধ্যে মহান আল্লাহতায়ালা সুরা তওবা আয়াত নং ১১৯-এ যে নির্দেশ করেছেন 'ওয়া কুনু মা'আস্বস্বা-দিক্বীন' অর্থ- 'আপনারা সত্যবাদীর সঙ্গী হউন'। মহান আল্লাহতায়ালা সুরা কাহফ-এর ১৭ নং আয়াতে আরও বলেন– 'ওয়া মাই ইউদ্বলিল ফালান তাজ্বিদা লাহু ওয়ালিয়্যাম মুরশিদা' অর্থ- 'মহান আল্লাহতায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন বা গোমরাহ্ করেন, তুমি কস্মিন কালেও কোন পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবে না। অর্থ্যাৎ কোন কামেল পীর-মোর্শেদ পাবে না' তাই একজন কামেল পীর-

মোর্শেদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, একজন কামেল মোর্শেদের সোহবতে গিয়ে আপনারা এই এলেম হাসিল করেন। তবেই শিরক বেদাত কী, এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবেন।

সুরা বাকারা, ৩৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন–

উচ্চারণ- 'ওয়া ইয কুলনা-লিল মালা ইকাতিস জূদু লিআ-দামা ফাসাজ্বাদূ-ইল্লা-ইবলীস; আবা-ওয়াস্তাকবারা ওয়া কানা মিনাল কাফিরীন।' আর্থ- যখন মহান আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাদের বললেন, আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলিশ ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে অমান্য করল ও গর্ব করল। সুতরাং সে কাফের হল।

কোরআনুল কারীমের সুরা বাকারা-এর ২৪৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন– উচ্চারণ, 'ওয়াক্বা-লা লাহুম ন্যাবিইয়্যুহুম ইন্না আ-ইয়াতা মূলকিহী আই ইয়া'তিয়াকুমুত তা-বূতু ফীহি সাকীনাতুম মির রাব্বিকুম ওয়া বাকিয়্যাতুম মিম্মা-তারাকা আ-লূ-মূসা ওয়া আলু-হারূণা তাহমিলুহুল মালা ইকাহ্ ইন্না ফী যালিকা লা-আ-ইয়াতাল লাকুম ইনকুনতুম মু'মিনীন।' অর্থ- আর তাদের নবী তাদেরকে বললেন, তার বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে একটি সিন্দুক আসবে যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের রবের তরফ থেকে প্রশান্তি। আর মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-এর বংশধরদের পরিত্যক্ত কিছু জিনিস। ফেরেস্তারা সেটি বহন করে আনবে। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের নিদর্শন।

টীকাঃ ২৪৮ বনী ইসরাইলগণের পুরুষানুক্রমে একটি সিন্দুক চলে আসছিলো। তার ভিতর হযরত মুসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীর স্মৃতি চিহ্ন রক্ষিত ছিল। বনী ইসরাইল যুদ্ধ বিগ্রহ করলে সিন্দুকটি সামনে রাখত। মহান আল্লাহতায়ালা তার বরকতে তাদের বিজয় দান করতেন। যখন তাদের উপর বিজয় হয় তখন সে এ সিন্দুকটিও সাথে নিয়ে যায়। তারপর আল্লাহতায়ালা যখন ইচ্ছা করলেন যে, এ সিন্দুকটি বনী ইসরাইলের নিকট পৌছে দেবেন, তখন জালুত সেটি যেখানেই রাখত সেখানেই মহামারীসহ বিভিন্ন বিপদ দেখা দিত। এভাবে পাঁচটি নগর জনশূন্য হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে সিন্দুকটি গরুর গাড়ির ওপর চাপিয়ে দিল এবং গরু দুটি ওই ব্যক্তির বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দিল। সে দুটি গরু হাঁকাতে হাঁকাতে তালুতের বাড়ির দরজায় পৌছে গেল। বনী ইসরাইল সেটি দেখে তালুতের রাজত্ব বিশ্বাস স্থাপন করল।

সূরা বাকারাহ, ২৪৮ নং আয়াত ও টীকা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, সিন্দুকটি বনী ইসরাইলরা যুদ্ধের সময় সামনে রাখত, যার কারণে তারা জয়লাভ করত। এখানে একটি চিন্তার বিষয় হল, সিন্দুক সামনে রাখার কারণে তারা বিজয়ী হত। আসলে বিজয় করার মালিক তো মহান আল্লাহতায়ালা। অথচ সিন্দুকের কী ক্ষমতা আছে? তাহলে এটা কি শিরক বলতেন? এক শ্রেণীর মানুষ কথায় কথায় শিরক বলে থাকে। আমি তাদের মতে বলছি। কোরআন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়

সিন্দুকের কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু তার ভিতরে নবীদের স্মৃতিচিহ্ন ছিল। এই স্মৃতির চিহ্ন'র বরকতে বনী ইসরাইলরা যুদ্ধে জয় লাভ করত। কেননা নবীদের মর্যাদা মহান আল্লাহ নিজে দিয়েছেন। নবীদের আপাদমস্তক পোশাক-পরিচ্ছদ, হাতের লাঠি মোবারক সবই রহমত এবং বরকতময়। নবীদের সম্মানে সিন্দুকের দ্বারা উপকার লাভ করল বনি ইসরাইলরা। কিন্তু যারা নবীদের মানত না, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। নবীদের স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত সিন্দুকটি এমেলেকা গোত্রের রাজা জালুত নামে জালেম বাদশা যে গ্রামে রাখত, সেই গ্রামের মানুষ মরে এলাকা শূন্য হয়ে যেত। পক্ষান্তরে বনী ইসরাইলরা যে গ্রামে বা স্থানে এটি রাখত, সেখানে রহমত ও বরকত হতো ও যুদ্ধে তারা জয় লাভ করতো।

এই আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল যারা নবীদের অনুসারী ছিল, তারা সিন্দুকের মাধ্যমে উপকার পেতো আর যারা নবীদের সাথে দুষমনী করত তারা ক্ষতিগ্রস্ত হত। এই আয়াতের নিদর্শন বুঝতে হলে, মুমিন হওয়া শর্ত। যারা মমিন না তারা নবীদের মুজেযা ও অলি-আউলিয়ালগণের কারামত বিশ্বাস করে না। তারা কোরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে নিজেরাও বিপদগামী হচ্ছে এবং অন্য মানুষকেও ভুল পথে ধাবিত করতেছে। সিন্দুকের ভিতরে নবীদের স্মৃতিচিহ্ন এক প্রকার তাবাররুক। কেননা বরকত হতে তাবাররুক শব্দটির উৎপত্তি।

সূরা ইউসূফের ৯৩ নং আয়াতে মহানআল্লাহ তায়াল বলেন– উচ্চারণ, 'ইয্হাবূ বিক্বামীছী হা-যা ফা-আলকুহু আলা ওয়াজ্বহি আবী ইয়া'তি বাছীরান ওয়া'তুনী বি-আহলিকুম আজ্বমা'ঈন।'

অর্থ- তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং এই জামা পিতার চোখের ওপর রেখে দিও। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন এবং তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার কাছে নিয়ে এসো।

৯৩ নং আয়াতের টীকাঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) বিন ইয়ামীন সম্পর্কে সবকিছু শোনার পর ছেলেদেরকে একটি পত্র দিয়ে পুনরায় মিশর পাঠান। বিন ইয়ামীনকে ফেরৎ চেয়ে পত্রটি আযীযে মিশরের উদ্দেশ্যে লিখিত ছিল। তার ছেলেরা মিশরে পৌছে ব্যবহৃত কয়েকটি আসবাবের বিনিময়ে ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে রসদপত্র তলব করে এবং সেই চিঠিখানা তার হাতে দেয়। তিনি চিঠিখানা পড়ে অত্যন্ত আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন এবং ভাইদের সঙ্গে কথার পর নিজের পরিচয় তাদের কাছে তুলে ধরেন। এরপর ইউসুফ (আঃ)-এর জামামোবারক ভাইদের হাতে দিয়ে বললেন, পিতার চোখের ওপরে রাখবা, চোখের ওপরে রাখার পরে চোখ ভাল হয়ে যাবে। তখন তোমরা তাদের সকলকে এখানে নিয়ে আসবে।

সুরা ইউসুফের ৯৩ নং আয়াতে ইউসুফ (আঃ)-এর জামার স্পর্শে তাঁর পিতার অন্ধ চক্ষু ভালো হয়ে গেল। অথচ চক্ষু ভালো করার মালিক মহান আল্লাহ। এখানে জামার কী ক্ষমতা আছে যে, জামার সাহায্য চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেল? তবে এটা কি শিরক বলবেন? না, তা কখনও বলা যাবে না। কারণ এটা কোনআন

শরীফের আয়াত মহান আল্লাহতায়ালার কালাম। যারা মহান আল্লাহতায়ালার কালামের ব্যাখ্যা করে বৈধ জিনিস শিরক বলে মানুষকে ভুলের দিকে নিয়ে যায়, তারা কুফুরী পর্যায় পৌছে যায়। আয়াতের জাহের-বাতেন মর্ম বুঝতে হবে। ইউসুফ (আঃ) মহান আল্লহতায়ালার একজন নবী ছিলেন। নবীর সম্মানে তাঁর জামা দামী ও বরকতপূর্ণ হয়েছে। কাজেই এটাও এক প্রকার তাবাররুক। বরকত বস্তুই তাবাররুক হিসাবে পরিগণিত হয়। কাজেই জামা যে চক্ষু ভালো করল, এটা শিরক বলা যাবে না। জামাটা ছিল বরকত স্বরূপ।

সূরা ছোয়াদ-এর ৪২ নং আয়াতে মহান আলাহতায়ালা বলেন– উচ্চারণ 'উরকুদ্ব বিরিজ্বলিকা হা-যা মুগতাসালুম বা-রিদুওঁ শারা-ব।' অর্থ- হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে বলা হল আপনার পা (জমিনে) মারুন এটাই গোসলের শীতল জায়গা এবং পানীয়।

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ হযরত আইয়ুব (আঃ) মহান আল্লাহতায়ালার একজন নবী ছিলেন। মহান আল্লাহতায়ালা আইয়ুব (আঃ)-কে কঠিন পরীক্ষায় ফেললেন। তাঁর সর্বাঙ্গে কীড়া বা পোকা পড়ল এবং সমস্ত শরীর ঘা পাঁচড়া হয়ে গেল, কিন্তু আইয়ুব (আঃ) মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি ঈমান অটল রাখলেন, তিনি আরও বেশি করে আল্লাহর ইবাদত বন্দীগিতে লিপ্ত হলেন। শয়তান আইয়ুব (আঃ)-এর ঈমান নষ্ট করার জন্য নানা প্রকার ফন্দিফিকির শুরু করে দিল, কোন অবস্থাতেই তাঁর ঈমান হরণ করতে পারল না। তিনি আরও দৃঢ়ভাবে ঈমানের ওপর অবিচল থাকলেন। এইভাবে ১৮ বছর শেষের দিনে রহিমা বিবি তাঁর স্বামীর জন্য খাদ্যের তালাসে বের হয়েছেন, এদিকে আইয়ুব (আঃ) তাঁর শোয়ার স্থানে পায়ের স্পর্শে মাটি ফেটে পানি উঠতে শুরু করল, পানির ফোটা আইয়ুব নবীর শরীরের যে জায়গায় পড়ে, সে জায়গার ঘা ভালো হতে লাগল। আস্তে আস্তে তিনি পুরোপুরি সুস্থ হলেন ফোয়-ারার পানি দিয়ে গোসল করলেন এবং কিছু পানি পান করলেন। ফলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলেন। এ সমস্ত লোকদের প্রতি আমার প্রশ্ন হল যে, মহান আল্লাহতায়ালা কুন ফা-ইয়া কুনের মালিক, অথচ আইয়ুব নবীর পায়ের আঘাতের পানি দ্বারা আরোগ্য করলেন কেন? এটা কি শিরক? না, এটা শিরক বলা যাবে না। কেননা এটা হলো মহান আল্লাহতায়ালার কালাম, এখানে পা মাটিতে পড়ার মাধ্যমে পানি বের হলো। পায়ের আঘাত হলো পানি বের হওয়ার মাধ্যম। মহান আল্লাহতায়ালা প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে মধ্যস্থতা রাখেন।

আল্লাহর অলিগণের কারামত :

প্রথম দলিল সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-৩৭-এ মহান আল্লাহতায়ালা বলেন– উচ্চারণ 'ফাতাক্বাব্বালাহা রাব্বুহা বিক্বাবূলিন হাসানিওঁ ওয়া আমবাতাহা নাবা-তান হাসানাওঁ ওয়া কাফফালাহা যাকারিয়্যা; কুল্লামা দাখালা আলাইহা যাকারিইয়্যাল মিহরা-বা ওয়াজ্বাদা ইন্দাহা রিযকা ক্বা-লা ইয়া-মারইয়ামু আন্না-লাকি হা-যা; ক্বা-

লাত হুওয়া মিন ইন্দিল্লা-হি ইন্নাল্লা-হা ইয়ারযুকু মাইঁ ইয়াশা-উ বি-গাইরি হিসা-ব।' অর্থ- অতঃপর তার প্রতিপালক তাঁকে উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন আর হযরত যাকারিয়া (আঃ)-কে তাঁর অভিভাবক বানিয়ে দিলেন। যখনই যাকারিয়া (আঃ) তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন তখনই তাঁর কাছে খাদ্যসামগ্রী পেতেন। তা দেখে হযরত যাকারিয়া বললেন– হে মরিয়াম, এ গুলো তোমার কাছে কোথা থেকে এসেছে? তিনি বললেন এগুলো আসছে আল্লাহর তরফ থেকে। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহতায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে অগণিত রিযিক দান করেন।

সুরা আল-ইমরানের ৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা : শিশু মরিয়মের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন নবী হযরত যাকারিয়া (আঃ)। তিনি ছিলেন এজেনের সন্তান। এজেন ছিলেন মুসলিমের সন্তান এবং মুসলিম ছিলেন সুদনের সন্তান। সুদুন ছিলেন হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর পুত্র। হযরত যাকারিয়া (আঃ) মরিয়ম (আঃ) -এর জন্য একটি প্রকোষ্ঠ (হুজুরা) নির্মাণ করলেন। মরিয়মকে দুগ্ধ দানের জন্য এক মহিলাকে নিয়োজিত করলেন। পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করলেন ইয়াহিয়া (আঃ)-এর জননীকে। যখন মরিয়ম (আঃ)-এর প্রাপ্ত বয়স হলো তখন মসজিদের মধ্যে একটি হুজরা শরীফ তৈরী করে দিলেন হযরত যাকারিয়া (আঃ), যার দরোজা মসজিদের ভিতরের দিকে। সিঁড়ি ছাড়া সে হুজরাখানায় ওঠা যেতো না। হযরত যাকারিয়া ছাড়া মরিয়ম (আঃ)-এর হুজরায় প্রবেশ করতো না কেউ। হযরত যাকারিয়া (আঃ) দেখতে পেতেন মরিয়ম (আঃ)-এর সামনে রয়েছে অমৌসুমী ফল। তিনি গ্রীষ্মের ফল শীতে এবং শীতের ফল গ্রীষ্মে দেখতে পেতেন। হযরত যাকারিয়া (আঃ) বলতেন, ফলগুলো কোথা থেকে এসেছে? মরিয়ম (আঃ) উত্তর দিতেন, মহান আল্লাহতায়ালার নিকট থেকে। মরিয়ম একজন আবেদাবাঁদী ছিলেন মহান আল্লাহতায়ালা তাঁকে পছন্দ করতেন, সে জন্য তাঁকে অমৌসুমের ফল খাওয়াইতেন। এভাবেই মরিয়মের সকলপ্রকার সাহায্য করে থাকেন মহান আল্লাহতায়ালা। কাজেই মহান আল্লহতায়ালার কুদরত অস্বীকার করা যাবে না। তদ্রুপ অলি-আউলিয়াগণকেও ঐশী জ্ঞান দান করেন মহান আল্লাহ। ঐশী শক্তির মাধ্যমে তাদের কারামত প্রকাশ হয়ে থাকে। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ এই বিদ্যা বা আধ্যাত্মিক এলেম বিশ্বাস করে না, এটা তাদের অজ্ঞতা। যা প্রকৃতির দ্বারা অলিদের মাধ্যমে প্রকাশ হয়, তাই কারামত। কারামত অনেক প্রকার আছে। তার মধ্যে যারা কামেল মোর্শেদ বা পীর, তারা আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে আল্লাহভোলা মানুষ, বে-নামাজী, বে-রোজাদার, মদদী, এবং বে-শরা কাজ করে বেড়ান, এমন মানুষদেরকে যিকির শিখিয়ে আল্লাহমুখী করে থাকেন। এটা কামেল অলি-আল্লাহদের আদর্শ ও কারামত।

কোরআন শরীফে সুরা মারইয়াম-এর ২৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ আরও বলেন– উচ্চারণ 'ওয়া হুযযী ইলাইকি বিজ্বিয'ইন নাখ্লাতি তুসা-ক্বিত্ব আলাইকি রুত্বাবান জ্বানিয়্যা।'

অর্থ- তুমি নিজের দিকে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর তর-তাজা খেজুর ঝরে পড়বে।

সুরা মারইয়াম ২৫ নং আয়াতের টীকা : তুমি তোমার দিকে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, ঐ কাণ্ড তোমাকে সুপক্ক তাজা খেজুর দান করবে। এখানে হুজ্জি ইলাইকা অর্থ নাড়া দাও, ঝাঁকি দাও, দোলা দাও। বিজিজই (তোমার দিকে) শব্দটির 'বা' অক্ষরটি এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। আর রুতাবান জ্বানিয়্যা অর্থ সুপক্ক তাজা খেজুর। উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহতায়ালার আলোচ্য নির্দেশ পেয়ে হযরত মরিয়ম (আঃ) শুকনো খেজুর গাছটি ধরে নাড়া দিয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গাছটি হয়ে গিয়েছিল সবুজ পত্র-পল্লব বিশিষ্ট ও ফলবান। আর তাজা ও পাকা খেজুর ঝরে পড়েছিল তাঁর আহার্য্য রূপে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, খেজুর গাছটি মরা ছিল, অথচ ঝাঁকি বা নাড়া দেওয়ার সাথে সাথে গাছ থেকে কাঁচা-পাকা খেজুর পড়ল কীভাবে? এটা এক প্রকার অলৌকিকত্ব। কিন্তু এক শ্রেণির মানুষ তা কোনভাবেই বিশ্বাস করতে চায় না। বরং দেখা যায় কারামত অমান্য করে শিরকের ব্যাখা দিয়ে সাধারণ মানুষকে কামেল বুজুর্গগণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

অলিগণের কারামতের দ্বিতীয় দলীল : সুরা কাহাফের ১৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন–

উচ্চারণ 'ওয়া তাহসাবুহুম আইক্বা-জ্বাওঁ ওয়া হুম রুকুদূওঁ ওয়া নুক্বাল্লিবুহুম যা-তাল ইয়ামীনি ওয়া যা-তাশ শিমা-লি ওয়াকালবুহুম বা-সিতুনযিরা আইহি বিল ওয়াছ্বীদি; লাওয়িত্ব ত্বালা'তা আলাইহিম লাওয়াল্লাইতা মিনহুম ফিরা-রাওঁ ওয়ালামুলি'তা মিনহুম রু'বা।' অর্থ: তুমি দেখলে মনে করতে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাই তাদের ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুরটি সামনের পা দুটি গুহা চত্বরে প্রসারিত করে অবস্থান করছিল। তুমি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখলে পিছনে ফিরে পলায়ন করতে ও তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে।

(সুরা কাহাফের আয়াত-১৮ বিশ্লেষণ) মুমিন যুবকগণ শহর ত্যাগ করে যাবার পথে এক ঈমানদার কৃষক তাদের সাথী হল এবং তাদের সাথে রওনা হল। কৃষকের কুকুরটিও তাদের পিছনে পিছনে চলতে লাগল। তারা কুকুরটিকে তাড়াবার চেষ্টা করেও তাড়াতে পারল না। মহান আল্লাহ কুকুরটিকে কথা বলার শক্তি দিলেন। কুকুরটি বলল, তোমরা আমাকে ভয় করো না। আমি আল্লাহর বন্ধুদের ভালোবাসি, আমি তোমাদের পাহারাদার হিসাবে থাকব।

অলিদের কারামত সুরা কাহাফের ১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে– হে আমার রসুল, আসহাবে কাহফকে দেখলে আপনি মনে করতেন, তারা বুঝি জেগেই আছে। কিন্তু না, তারা ছিলো নিদ্রিত। ঘুমের ঘোরে কখনো কখনো পার্শ্ব পরিবর্তন করতো মাত্র। অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেছেন,

আসহাবে কাহফের সঙ্গী প্রাণীটি ছিলো কুকুর।
হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সেটি ছিলো একটি বৃহদাকৃতির কুকুর। এক বর্ণনায় এসেছে কুকুরটি ছিলো মাঝারী ধরণের। মুকাতিল বলেছেন, সেটির রঙ ছিলো হলুদ। কুরতুবী বলেছেন, গাঢ় হলুদ। কালবী বলেছেন, তার লোম ছিলো ধুনিত পশম অথবা তুলার মতো। হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কুকুরটির নাম ছিলো কিতমীর। হযরত আলী বলেছেন, তার নাম ছিলো রাইয়্যান। আওজায়ী বলেছেন, তাকুর। সুদ্দী বলেছেন, ছাত্তর। কাব বলেছেন, সাহবা। সুদী বলেছেন, আসহাবে কাহফ যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন, তখন কুকুরটিও ডান কাঁতে শুত। আবার যখন তাঁরা বাম কাঁত হতেন, তখন কুকুরটিও বাম কাঁত হয়ে শুয়ে থাকতেন।
তিন শত বছরের অধিককাল আগে যখন তাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন নগরীর নাম ছিল আফছম তাই। তাদের মুদ্রাগুলোতে অংকিত ছিল ঐ নাম ও তৎকালীন রাজার নাম। নগরটি তখন ছিলো মূর্তিপূজক জনগোষ্ঠির প্রভাবিত। পরে ধীরে ধীরে নগরবাসীরা হয়ে যায় এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী। নগরীর নামও তখন পরিববর্তন হয়ে যায়। আফসুমের বদলে নতুন নামকরণ করা হয় তারতুশ।
প্রিয় পাঠকগণ! সুরা কাহফের ১৮ নং আয়াত পর্যালোচনা করলে প্রতিয়মান হয় যে, তিন'শ বছরের অধিককাল তাঁরা গুহার মধ্যে কীভাবে কাটাল এটা মহান আল্লাহতায়ালার কুদরত। এটা কি অলৌকিকতা নয়? তিন'শ বছরের মধ্যে তাঁরা রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া কিছুই করে নাই। আসহাবে কাহাফ যখন দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হল তাঁরা একে আপরকে বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছো? কেউ বলল একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। নিদ্রা ছিল স্বাভাবিক নিদ্রার চেয়ে কিছুটা গভীর ও প্রলম্বিত। এক বর্ণনায় এসেছে জেগে উঠে তাঁরা বুঝতে পারলেন, নামাযের সময় উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাঁরা গুহায় প্রবেশ করেছিলেন সকালে এবং জাগ্রত হয়েছিলেন সন্ধ্যার পূর্ব ক্ষণে। অথচ তাফসিরকারকের মতে এরই মধ্যে ভিতর তিন'শ বছরের অধিককাল অতিবাহিত হয়েছে। এগুলো সবই আল্লাহর কুদরত, অলৌকিক, যাকে সহজ ভাষায় বুঝি কারামত।
কিতমীর নামের কুকুরটির অবস্থাও একই রূপ। কুকুর গুহাবাসীদের পাহারা দিয়ে সেও জান্নাতী হয়ে গেল। কুকুর মহান আল্লাহর অলিদের চিনলো, যার কারণে সে নিয়ামত লাভ করলো। বর্তমানে এক শ্রেণির গোমরাহ পথভ্রষ্ট গোঁরা লোক, তারা কোনক্রমেই অলিদের কারামত বিশ্বাস করে না, কামেল পীরদেরও মানে না। কেননা তাদের ভিতর হিংসা-রিপু বিরাজ করে। কোরআনের অকাট্য আয়াত ছাবেত করলেও তারা বলে এটা সাধারণ কথা, অলিদের ব্যাপারে যে আয়াত আবতীর্ণ হয়েছে, তা কখনও তারা মেনে নিতে পারে না। এই সমস্ত লোককে আল্লাহতায়ালা গোমরাহ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।
অলিগণের কারামত তৃতীয় দলীল : সুরা কাহফ -৭১ নং আয়াতে মহান

আল্লাহতায়ালা বলেন– উচ্চারণ-'ফানত্বালাকা হাত্তা-ইযা রাকিবা-ফিস সাফীনাতি খারাক্বাহা; ক্বা-লা আখারাক্বতাহা লিতুগরিক্বা আহলাহা; লাক্বাদ জ্বি'তা শাইআন্ ইম্‌রা।' অর্থ : অতঃপর তারা চলতে শুরু করলো, অবশেষে তারা যখন একটি নৌকায় আরোহন করলো, তখন হযরত তা ছিদ্র করে দিলেন, মুসা (আঃ) বললেন, আপনি কি তার আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য একে ছিদ্র করে দিলেন? আপনি তো এক অন্যায় কাজ করলেন।

আয়াতের ব্যাখ্যা :
হযরত খিজির (আঃ) যেমন অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারলেন এই নৌকা ভালো থাকলে জালেম বাদশাহ তার রাজদরবারে জমা নেবে, ফলে নৌকার আরোহীর কর্ম বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার রুজি-রোজগার বন্ধ হবে। সংসারে অভাব-অনটন দেখা দিবে। জালেম বাদশাহ যেন নৌকা না নিতে পারে, সে জন্য নৌকা ছিদ্র করে দিলেন। কিন্তু মুসা (আঃ) সেটা বুঝতে পারলেন না বিধায় হযরত খিজির (আঃ)-এর কাজে বাধা দিলেন। এটাই এলমে লাদুন্না। এটা একপ্রকার খিজির (আঃ)-এর কারামত। এই কারামত এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। কামেল পীর যারা তাদের অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে তাদের কারামত প্রকাশ হয়ে থাকেন। তাদের হাতের দেওয়া তাবাররুক দ্বারা রোগ-বালা ভালো হয়ে যায়, কিন্তু এক শ্রেণির মানুষ অলিদের কারামত বিশ্বাস করে না বরং শিরক বলে অপব্যাখা করে। জেনে রাখবেন, কারামত কখনও শিরক হতে পারে না। শিরকের সংজ্ঞা হলো আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা।
৪র্থ নং দলীল অলিদের কারামত : সূরা কাহফ ৮৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন– উচ্চারণ 'ইন্না- মাক্বান্না লাহু ফিল আরদ্বি ওয়া আ-তাইনাহু মিন-কুল্লি শাই ইন সাবাবা।' অর্থ- আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ে যথেষ্ট উপায় উপকরণ দিয়েছিলাম।
৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা : বাদশাহ জুলকারনাইন একজন আল্লাহর অলি ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পরিভ্রমণের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনি যখন এশিয়ার উত্তর পূর্ব অঞ্চলে যান সেখানে ইয়াজুজ মাজুজ নামে এক উচ্ছৃঙ্খল জাতির ব্যাপারে অবগত হন। যে জাতিগুলো প্রাচীনকাল থেকে সভ্য দেশগুলোর ওপর ধ্বংসাত্মক বর্বর হামলা চালিয়ে এসেছে এবং মাঝে মাঝে প্লাবনের মত উত্থিত হয়ে এশিয়া ও ইউরোপ উভয় দিকেই মোড় নিতে থাকে। হিযকিয়েলে কিতাব (৩৮-৩৯ অধ্যায়) রুশ ও তোবল (বর্তমান তোবলস্ক) এবং মসকে (বর্তমানে মস্কো) এদের এলাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাঈল ঐতিহাসিক ইউসিফুস ইয়াজুজ মাজুজ অর্থে সিথিয়ান কওম বুঝেছেন। যাদের এলাকা ছিলো কৃষ্ণ সাগরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত। জিরুমের বর্ণনা মতে– মাজুজর ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের নিকট বসবাস করত। তাদের বর্বতা খর্ব

করার জন্য বাদশাহ জুলকারনাইন অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে তাদের এলাকার সামনে এক মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করেন, ফলে তারা আর সভ্য জাতির ওপর আক্রমণ করতে পারলো না, এটা ছিলো জুলকারনাইনের অলৌকিক কারামত।

অলিদের কারামতের ৫ম দলীল :
সুরা নামল ৪০ নং আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন– উচ্চারণ 'ক্বা-লাল্লাযী ইন্দাহু ইলমুম মিনাল কিতা-বি আনা আ-তীকা বিহী ক্বাবলা আই ইয়ারতাদ্দা ইলাইকা তারফুক; ফালাম্মা- রা আহু মুস্তাক্বিররান ইন্দাহু ক্বা-লা-হা-যা- মিন্ ফাদ্বলী রাব্বি; লিইয়াবলু-অনী আ-আশকুরু আম্ আকফুর; ওয়া মান শাকারা ফা-ইন্নামা ইয়াশকুরু লিনাফসিহ্; ওয়া মান কাফারা ফা-ইন্না রাব্বি গানিইয়্যুন কারীম।' অর্থ- যার কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল, আমি তা এনে দেব আপনার সামনে, আপনার চোখের পলক ফিরাবার পূর্বেই। অতঃপর যখন সুলায়মান (আঃ) সেটিকে তাঁর সামনে উপস্থিত দেখতে পেলেন তখন বললেন, এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সে নিজেরই জন্য করে এবং যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে নিক যে, আমার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী মর্যাদাবান।

৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা :
হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে একজন আধ্যাত্মিক এলেমের অধিকারী ছিলেন, যখন মুলকে ছেবা রাজ্যের রাণী বিলকিস হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে আসার জন্য যাত্রা শুরু করলেন, হযরত সোলায়মানের দরবারে আসার অনতিদূরে থাকাবস্থায় সোলায়মান তার পরিষদবর্গের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাণী বিলকিসের সিংহাসনকে এনে হাজির করতে পার। জীনদের মধ্যে কেউ বললেন, হুজুর দু'এক ঘন্টা সময় দিলে সিংহাসন এনে দিতে পারবো। সোলায়মান (আঃ) বললেন, এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে কে পারবে? তখন তার পরিষদের একজন কাশফধারী অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি মহান আল্লাহতায়ালার একজন অলি আসিফ বিন বরখীয়া বললেন, যদি আপনার কৃপা হয় তাহলে আপনার চোখের পলক ফিরাবার পূর্বেই রাণী বিলকিসের সিংহাসন হাজির করতে পারব। তখন হযরত সোলায়মান তাকে হুকুম দিলে তিনি তার কাশ্‌ফ শক্তির বলে মুহূর্তের মধ্যে সিংহাসন এনে হাজির করলেন। রাণী বিলকিস যখন সোলায়মান (আঃ)-এর রাজ দরবারে হাজির হলেন, তখন সোলায়মান (আঃ) রাণী বিলকিসকে কৌতুক করে বললেন, এটা কি আপনার সিংহাসন? রাণী বিলকিস উত্তর দিলেন এটা অবিকল আমার সিংহাসনের মতই। তখন তার সিংহাসনে বসতে বললেন।
ইসলাম ধর্মের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে আমার প্রশ্ন– আসিফ বিন বরখিয়া তার

অলৌকিক শক্তির বলে অনেক দূরের একটা রাজ্য থেকে কোনো যান বাহন ছাড়া কীভাবে রাণী বিলকিসের সিংহাসন হাজির করলেন? তা হলে কি আসিফ বিন বরখিয়াকে শিরক বলবেন? এই আসাধ্য কাজ সাধ্য করার জন্য মহান আল্লাহতায়ালা দয়া করে তাকে সেই শক্তি দান করেছিলেন। কাজেই তাকে শিরক বলা যাবে না।
এই ঘটনা কোরআন শরীফের সুরা নামলের ৪০নং আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেল অলি-আল্লাহদের কারামত আছে এবং থাকবে। কারামত কখনও অস্বীকার করা যাবে না এবং শিরকও বলা যাবে না। যারা অলি-আল্লাহদের কারামত শিরক বলে থাকে, তারা সুরা নমলের ৪০ নং আয়াত অস্বীকার করল। কোরআন শরীফের একটি কালাম বা আয়াত অস্বীকার করলে তার ঈমান চলে যাবে।

আল্লাহর অলিগণ সমস্যার সমাধানদাতা :
সুরা বাক্বারাহ ৬০ নং আয়াত-এ মহান আল্লাহতায়ালা বলেন–
উচ্চারণ 'ওয়া ইযিস্তাসক্বা মূসা- লিকাওমিহী ফাকুলনাদ্বরিব বি'আস্বা-কাল হাজ্বার, ফান্‌ফাজ্বারাত মিনহুছ নাতা- আশরাতা আইনা; ক্বাদ আলীমা কুল্‌লু উনা-সিম মাশরাবাহুম; কুলূ ওয়াশরাবু মির রিযক্বিল্লা-হি ওয়ালা তা'ছাও ফিল আরদ্বি মুফসিদীন।' অর্থ: আর স্মরণ কর, যখন মুসা (আঃ) তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা এ পাথরে আঘাত কর। ফলে তা থেকে বারটি পানির ফোয়ারা নির্গত হল। চিনে নিল প্রত্যেক গোত্রই তাদের পান করার স্থান। তোমরা আল্লাহর দেওয়া রুজী খাও, পান কর। আর পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টি করে ফিরো না।

বাক্বারাহ ৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা :
যে দিকে দৃষ্টি যায় সে দিকেই কেবল ধু-ধু বালুকারাশি, বৃক্ষগুল্মহীন প্রান্তর পাথুরে পাহাড় ওই প্রান্তরে বন্দী, বনি ইসরাঈলীরা হয়ে পড়ল তৃষ্ণার্ত। হযরত মুসা (আঃ) মহান আল্লাহতায়ালার সকাশে পানি প্রার্থনা করলেন। মহান আল্লাহতায়ালা বললেন, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ওই লাঠিটি ছিলো বেহেশতের একটি লাঠি। দশহাত লম্বা ছিলো লাঠিটি। চিহ্নিত ছিলো দু'টি ভাগে। অন্ধকারে আলো দিত লাঠি থেকে। হযরত আদম (আঃ) এই লাঠি বেহেশত থেকে এনেছিলেন। পরে বংশানুক্রমে লাঠিটি হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর হাতে এসে পড়ে। তাঁর মাধ্যমে হযরত মুসা (আঃ) লাঠি পান। লাঠি দ্বারা যে পাথরে আঘাত করতে বলা হয়েছে, সে পাথরটি ছিলো চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। আকারে ছিলো মানুষের মাথার সমান। হযরত মুসা (আঃ) ওই পাথরটি একটি চামড়ার থলিতে সংরক্ষণ করতেন। এরকমই বলেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। আতা খোরাসানী

বলেছেন, ওই পাথরটির ছিলো চারটি কোণ প্রতি কোণ থেকে তিনটি করে ঝর্ণা প্রবাহিত হতো। এমনিভাবে বারোটি ধারা প্রবাহিত হতো বারোটি গোত্রের জন্য। হযরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, এ পাথরটি ছিলো ওই পাথর, যার উপরে পরিধেয় রেখে হযরত মুসা (আঃ) নদীতে গোসল করতে নেমেছিলেন। ঘটনাটি এ রকম– হযরত মুসা (আঃ) তাঁর পবিত্র শরীর প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখতেন। এতে করে কিছু লোক মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর একশিরা নামক ব্যাধি আছে। এটাই তাঁর অতিরিক্ত বস্ত্র ব্যবহারের কারণ। মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা ছিলো তিনি তাঁর প্রিয় রাসুলকে অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। তাই সংঘটিত হলো এ ঘটনা। একটি নির্জন স্থানে একটি পাথরের উপরে গাত্রাবরণ রেখে পানিতে নামলেন হযরত মুসা (আঃ) ঠিক তখনই গাত্রাবরণ নিয়ে পাথরটি দৌড়াতে শুরু করলে পাথরের পিছনে পিছনে হযরত মুসা (আঃ)-ও দৌড়াতে শুরু করলেন। এ অবস্থায় ওই লোকদের সম্মুখীন হলেন যারা আপবাদ রটিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সামনে পাথরটি থেমে পড়লো। অতি দ্রুত পাথরে রাখা কাপড় নিয়ে তিনি তাঁর পবিত্র শরীর আচ্ছাদিত করলেন। হঠাৎ জিব্রাইল (আঃ) অর্বিভূত হয়ে বললেন, মহান আল্লাহতায়ালার নিদের্শ এই যে, পাথরটি আপনার কাছে রাখুন। ভবিষ্যতে এক সময় মহান আল্লাহতায়ালার কুদরত এবং আপনার আলৌকিকত্ব এই পাথরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। এখানে একটি গভীর চিন্তার বিষয় হলো মহান আল্লাহতায়ালা সমস্ত ক্ষমতার মালিক অথচ পাথরের মধ্যে কী ক্ষমতা দান করলেন? পাথর ও লাঠি দুটির মধ্যে কী ক্ষমতা দান করলেন? পাথর ও লাঠি দুটি জড় পদার্থ, জড় পদার্থের কোন প্রাণ নাই। তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারে না। অথচ এখানে পাথরের মধ্য থেকে বারোটি পানির ঝর্ণা নির্গত হলো আবার মুসা (আঃ)-এর পরনের কাপড় নিয়ে দৌড়াতে থাকলো, তা হলে কি এটা শিরক হয়ে গেল? যারা আল্লাহর কুদরতে নবীদের মোজেযা ও অলি-আউলিয়াদের কারামতে অবিশ্বাসী, তাদের কাছে শিরক হবে, কিন্ত যারা নবীদের মোজেযা ও অলি-আউলিয়াদের কারামত বিশ্বাস করে, তাদের কাছে শিরক হবে না। পাথর ও লাঠির দ্বারা যা প্রকাশ হয়েছে, সবই অলৌকিকত্ব। কাজেই শিরক বলা যাবে না, বরং বালুরাশির মধ্যে আটকাপড়া বনি ইসরাঈলরা পানির তৃষ্ণা মিটাল এবং পাথরের সাহায্যে জীবন রক্ষা পেল।

কোরআন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পাথর ও লাঠির চেয়ে মানুষ উত্তম, মানুষের মধ্যে যারা মহান আল্লাহতায়ালার অলি-আউলিয়া তারা আল্লাহর বন্ধু এমন কি ১৮ হাজার মাখলুকের মধ্যে মানুষ হলো 'আশরাফুল মাখালুকাত' সেরা। 'খাতামাল্লাহু আলা কুলু-বিহীম' অর্থ- মহান আল্লাহতায়ালা তাদের অন্তরের মোহর মারিয়া দিয়াছেন। যেমন আবু জাহেল নবীজিকে বলেছিলো, মোহাম্মাদ তুমি যদি পূর্ণিমার চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখাইতে পারো তাহলে তোমার কালেমা গ্রহণ

করব, তোমার খোদাকে মানবো। মহান আল্লাহতায়ালা ফেরেশতার মাধ্যমে নবীজিকে জানাইয়া দিলেন আপনি চাঁদের দিকে শাহাদাৎ আঙ্গুল দিয়া ইশারা করুন। নবীজি যখন শাহাদাৎ আঙ্গুল দিয়া ইশারা করলেন সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। কিন্ত আবু জাহেল ইহা দেখিয়া বললেন, মোহাম্মদ জাদুকর। আবু জাহেল মানুষদেরকে উসকানী দিয়া মোহাম্মদ (সঃ) থেকে দূরে রাখার জন্য আরো বলেছিল, মোহাম্মদের জাদু জমিনেও চলে, আসমানেও চলে।

বেদাত প্রসঙ্গে :

'বেদাত' অর্থ নতুন কিছু আবিষ্কার করা। রাসুল (সঃ)-এর পরে যা আবিষ্কার করা হয়, তাই বেদাত।

বেদাত-ইটের তৈরী মসজিদ- সুন্নতি মসজিদ হলো মাটির তৈরী। মাদ্রাসা- রাসুল (সঃ)-এর যুগে ছিল না। জুমার নামাজের দুই আজান- হযরত উসমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে চালু হয় (বুখারী শরীফ)। কোরআন শরীফ একত্রিতকরণ- হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর নির্দেশে (বুখারী)। তারাবিহ নামাজ জামায়াতে আদায় হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে চালু হয় (বুখারী)। রমজানে তৃতীয় দিনে তারাবিহ্ নামাজের মধ্যে কোরআন খতম-ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে জামাতে ৩দিনে ১ খতম দিতেন, তারাবি নামাজে।

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– উচ্চরণ 'ওয়া ফিস শার-য়ী আহাদিসু মা-লাম ইয়াকুনা আলা-আহাদী রাসূলিল্লাহি সাল্লালহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।' অর্থ: শরিয়তের পরিভাষায় বিদআত বা বেদাত হচ্ছে এ ধরণের কাজের সুচনা করা, যা নাকি নবী করিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ছিল না।

বোঝা গেল ধর্মীয় বা দুনিয়াবী যা-ই নবী সাল্লাল্লাহ আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের পরে সুচনা বা নতুন জিনিস আবিষ্কার করা হবে, তাই বেদাত। আমলী বেদাত দুই প্রকার, হাছানাহ ও ছাইয়েআহ। হাছানাহ ঐ ধরণের নতুন কাজকে বলে যা কোন সুন্নাতের বিপরীত নয়। যেমন মিলাদ শরীফ, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোরআন শরীফ ছাপানো ইত্যাদি। বেদাতে ছাইয়েআহ ঐ নতুন কাজকে বলা হয়, যা কোন সুন্নাতের বিপরীত বা শরিয়ত খেলাপ। কোন সুন্নতকে বিলুপ্তকারী হিসাবে বিবেচিত হয়, যেমন ঈদ ও জুমার খুতবা আরবি বাদ দিয়ে অন্য ভাষায় পড়া। বেদাতে হাছানাহ জায়েদ ও মুস্তাহাব কোন কোন সময় ওয়াজেবও হয়। বেদাতে ছাইয়েআহ হচ্ছে মাকরূহ তানজিহী বা তাহরীমী। কোন কোন পর্যায়ে হারামও হয়ে যায়। বেদাতে হাছানাহ ও ছাইয়েআহ এর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

হযরত আবদুল হক মুহাদ্দেছে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– উচ্চরণ 'ওয়ান সাহু মাওয়া ফিক্বিন উসূলা কা-ওয়াইদা সুন্নাতু আস্ত; কিয়াসু কারদ্বাহ্ ছোদাহ্ আ-রা বেদাতু হাসানাহ্ গুয়েদ ওয়ানসাহ্ মোখালেফাতু আ-বাসাদ্ব বেদাতু

দ্বালালাতি গুয়েদ।' অর্থ: যে বেদাত ধর্মের মূলনীতি ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এক সঙ্গে কিয়াছ করা হয়েছে তাকে বেদাতে হাছানাহ বলা হয়। আর যা তার বিপরীত তা গোমরাহী। বর্ণিত বিষয়ে আবদুল হক মোহাদ্দিছে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উক্তি যথা- এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ইমাম শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– উচ্চরণ 'ক্বালা আল-ওলামাউ হা-জিহী আহাদ্বী-সূ মান কা-ওয়াইদীল ইসলামী ওয়া হুয়া আন্না কুল্লা ফান্না এবতাদা আ'শাইয়ান আ-নিস শার্‌রী কানা আলাইহি মিস-লু ওয়াজরীন মানিফ ত্বাদাবিহী ফি-যালিকা ওয়া কুল্লা মানিব তাদা'আ শাইয়ান আনিল খাইরী ক্বানা লাহু মিসলু আজরীন; কুল্লু মাইয়্যা মাল ইলা ইয়াও-মাল কিয়ামাহ্।' অর্থ: মুহাক্কেক ওলামায়ে কেরাম বলেন, উপরোক্ত হাদিসসমূহ ইসলামের মূল কানুন হিসাবে প্রযোজ্য, যে কেউ ইসলামে কোন মন্দ কাজের সূচনা করে সে সকল আমলকারীদের গুনাহের অংশীদার হবে। আর যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজে সূচনা করেন তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সকল আমলকারীদের সমান সাওয়াবের অধিকারী হবেন।' এতে এটাই প্রমাণিত হলো যে, ভালো বেদাতে ছাওয়াব বা নেকী আর মন্দ বেদাতে পাপ আছে।

বেদাত সর্ম্পকে মোল্লা আলী কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– উচ্চরণ 'আলা বিদয়াতু আম্মা ওয়াজিবাতুন কাতা'লিমিন নাহ্‌বি ওয়াছাদ-বিন উসুলূল ফিকাহী ওয়া আম্মা মুহার্‌রামাতু কা-মাজহাবিল জাবরীয়াতি ওয়া আম্মা মাশদুবাতু কা-আহ্‌দাসির রাওয়াবিতি ওয়াল মাদারিছি ওয়া কুল্লু আহাদাসিন মা-লাম ইয়া'হাদু ফিস সাদরীল আওয়ালী কাছরা আওহি আয়্যিল জামাতাল আমা আম্মা মাকরুহাতুন কাজখুর ফিল মাছাজিদি ওয়া আম্মা মোবাহাতুন কাল মোছাফাহাতি আক্বিবাল ফাজরী ওয়াত তাওয়াছি-ঈ বিল যিযিজিল মাকাল।' অর্থ: বেদাত হয় ওয়াজিব, যেমন আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা এবং ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতিগুলোকে একত্রিত করা। বেদাত হারাম, যেমন জাবরীয়া সম্প্রদায়। বেদাত মুস্তাহাব যেমন, মুছাফিরখানা এবং মাদরাসা কলেজ ইউনিভার্সিটিসমূহ তৈরী করা এবং প্রত্যেক ভালো কাজ যা আগের যুগে ছিল না, যেমন মসজিদগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য কারুকার্য করা এসি লাগানো, ঝাড়বাতি লাগানো, আজানে ও নামাজে মাইক ব্যবহার করা, মাইক দিয়া ওয়াজ নছিহত করা, বিদ্যুৎ দিয়ে লাইট জালানো।

জামে ছগীর কিতাবের ভাষ্যেও বেদাত পাঁচ প্রকার পাওয়া যায়। সুতরাং বোঝা গেল বেদাত বলতেই হারাম বা মন্দ কাজ নয়। যদি মন্দ হতো তাহলে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ আলোচনা করতেন না। তাই ফতোয়ার কিতাবে বেদাত পাঁচ প্রকার দেখা যায়। ওয়াজিব, মুস্তাহাব, জায়েয, মাকরূহ এবং হারাম। 'দুররুল মুখতার' কিতাবে আজান অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। আজানের পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করা ৭৮১ হিজরীতে চালু হয়। কিন্তু তা বেদাত হাছানাহ হিসাবে গণ্য। আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– উচ্চরণ 'ফাফিহী দালিলি আলা আন্না-হু গায়রা

মাকরুহি লে-আন্নাল মাওয়া রিসা লা-ইয়াকুনু মাকরুহা কাজালিকা তাকুলু ফিল আযানে বাইনা ইয়া দা-ইল খাতিবী ফায়াকুনূ বেদাতুন হাসানাহ্ ইযা মা-রাহুল মু'মিনূ হাসানান্ ফাহুয়া ইনদাল্লাহি হাসান।' অর্থ: সুতরাং প্রমাণিত হলো একাজ মাকরূহ নয় কেননা পুনঃপুনঃ হওয়ার ফলে অথবা যুগ পরম্পরায় মুসলমানদের আমলের ফলে কোন কাজ মাহরূহ নয়। অনুরূপ খুতবা প্রদানকারীর সামনে আজান দেওয়া বেদাত হাছানাহ বলে গণ্য করা হয়, যখন মুমিনগণ কোন কাজ ভালো মনে করে থাকেন আল্লাহর নিকটও তা ভালো।

মহান আল্লাহতায়ালা বলেন– উচ্চরণ 'আল ফেৎনাতু আস্বাদ্দু মিনাল ক্বাতলি।' অর্থ: ফেতনা সৃষ্টি করা, মানুষ কাতেল বা হত্যা করার চেয়েও বড় গুনাহ।

সুতরাং মিলাদ-কিয়াম, আজানের পূর্বে দরূদ পাঠ, মাদরাসা তৈরি ও কোরআন ছাপানো এ রূপ হাজার হাজার ভালো কাজ সমাজে চলছে যা বেদাত হাছানাহ বা উত্তম বেদাত।

সুরা নিসা ১৫০-১৫১-১৫২ নং আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন– উচ্চারণ 'ইন্নাল্লাযীনা ইয়াগফুরুনা বিল্লা-হি অরুসুলিহী অইয়ুরীদূনা আইঁ ইয়ুফার্‌রিকু বাইনাল্লা-হি অরুসুলিহী অইয়াকু লূনা নু'মিনু বিবা'দ্বিওঁ অনাকফুরু বিবা'দ্বিওঁ অইয়ুরীদূনা আইঁ ইয়াত্তাখিযু বাইনা যা-লিকা সাবীলা। উলা- য়িকা হুমূল ক্বাফিরুনা হাক্ব ক্বান অআ'তাদনা লিল্‌কা-ফিরীনা আযা-বাম্ মুহীনা অল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি অরুসুলিহী অলাম্ ইয়ুফার্‌রিকু বাইনা আহাদিম মিনহুম উলা-য়িকা সাওফা ইয়ু'তীহিম উজু রহুম অকা-না ল্লা-হু গফুর্‌র রাহীম।' অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ ও তার রাসুলদেরকে অবিশ্বাস করে আর আল্লাহ ও তার রাসুলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে যে, আমরা কতেককে মানি আর কতেককে মানি না, এর মাঝেই তারা, ফেৎনা সৃষ্টি করতে চায়, প্রকৃতপক্ষে এরাই কাফের, কাফেরদের জন্যই আমি প্রস্তুত করে রেখেছি লাঞ্ছনাকর শাস্তি। আর যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের ওপর বিশ্বাসী তাদের মধ্যে যাহারা কোন পার্থক্য করেনি, শিঘ্রই তাদের প্রদান করা হবে তাদের প্রতিদান। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। আমিন

প্রাপ্তি স্থান : কুতুববাগ দরবার শরীফ (সদর দপ্তর)
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
হাদিয়া : ২৫ টাকা